বাংলাদেশের 'অস্পৃশ্য' জাতি: ডোম ও মেথর

লিখেছেন **আসহাবুর রহমান**

ষোড়শ শতাব্দীতে পশ্চিমের অভিযাত্রীরা ইন্ডিয়ায় আসার পরে ইউরোপ হিন্দু জাতিবর্ণ প্রথা (Caste System) আবিষ্কার করে। এরপর থেকে তা এখন পর্যন্ত পাশ্চাত্যের পণ্ডিত-বিদ্বানদের ধাঁধায় রেখেছে কারণ এ ধরনের সমাজ সংগঠন পৃথিবীর অন্যত্র নেই। পশ্চিমের বিদ্বানরা হিন্দু জাতিবর্ণ ব্যবস্থার উদ্ভব, গঠন, কাঠামো, তা কিভাবে কাজ করে তার মতাদর্শিক ভিত্তি, পরিবর্তনশীলতা ইত্যাদি নানান বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তত্ত্ব নির্মাণ করেছেন। ইন্ডিয়ায় গত চারশ' বছর থেকে আগত খ্রিস্টান মিশনারি, সৈনিক, ভাগ্যান্বেষী যোদ্ধা, অভিযাত্রী, পর্যটক ও ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক প্রশাসক প্রমুখের পর্যবেক্ষণ, স্মৃতিকথা, ইতিহাস ও বিবরণ ছাড়াও গত একশ' বছরে ইন্ডিয়ার জনগোষ্ঠী ও সমাজ সম্পর্কে সমাজবিজ্ঞানীরা যেসব এথনোগ্রাফিক সমীক্ষা করেছেন সেগুলো ব্যবহার করে জাতিবর্ণ ব্যবস্থার বেশ কিছু তত্ত্ব লেখা হয়েছে। তবে আর. এস. খারে, বীনা দাশ, আর. জি. বেইলি, জোনাথন প্যারি, লুই দুমোঁ, মাইকেল মোফাট, জেরাল্ড বেরেম্যান, টি. এন. মদন, আন্দ্রে বেতিল ও অন্যান্য নৃবিজ্ঞানী ও সমাজবিজ্ঞানীরা যেসব তত্ত্ব তৈরি করেছেন সেগুলোর মধ্যে ঐকমত্য নেই। তবে এটি যে দক্ষিণ এশীয় হিন্দু সমাজের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এ ব্যাপারে তারা সবাই একমত।

সমাজবিজ্ঞানীরা বলেন যে, যে জাতিবর্ণ প্রথা 'শুদ্ধতা ও অশুচি'র (Purity and Pollution) ভিত্তিতে হিন্দু সমাজকে অনতিক্রম্য সামাজিক মর্যাদা ও পদক্রমে বিভক্ত করার একটি ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থায় হিন্দু জনসংখ্যা বহুসংখ্যক 'জাতি'তে বিভক্ত থাকে। 'জাতি' বলতে বোঝায় জন্মসূত্রে প্রাপ্ত একটি সুনির্দিষ্ট দলের সদস্যপদ। চলতি ভাষায় এটি 'জাত' রূপে উচ্চারিত। অন্যদিকে 'বর্ণ' হচ্ছে সামাজিক মর্যাদা ও পদক্রমের জ্ঞাপক। যেমন উত্তর প্রদেশে 'সিং' ও 'ঠাকুর' দুটোই 'জাতি' কিন্তু এ দুটো জাতি ক্ষত্রিয় বর্ণভুক্ত। তাই 'জাতি'র সংখ্যা অনেক হতে পারে কিন্তু তাদের বর্ণ মর্যাদা মাত্র চারটি, যথা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। হিন্দু সমাজে কোনো ব্যক্তির প্রথম পরিচয় তার 'জাতি' বা 'জাত' দিয়ে। তবে হিন্দু সমাজে ঐ চারটি বর্ণের বাইরেও অনেক 'জাত' আছে যারা বর্ণহীন বলে 'অস্পৃশ্য' ও 'অচ্ছুৎ'। যেমন ডোম, হাড়ি, চণ্ডাল, মালো, বাগ্দি, কাহার, মুচি, মেথর, চামার। এছাড়া একটি অভিন্ন 'বর্ণভুক্ত অনেকগুলো 'জাতে'রও মর্যাদা সমান নয়। কোনো 'জাতে'র উঁচু কারো নিচু মর্যাদা। যেমন বাঙলার রাঢ়ী ব্রাহ্মণের মর্যাদা বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের তুলনায় উঁচু অর্থাৎ প্রথমোক্তরা 'কুলীন' ব্রাহ্মণ। আবার রবীন্দ্রনাথের বংশ রাঢ়ীদের থেকে নিচের 'পিরালি' ব্রাহ্মণ। বহু

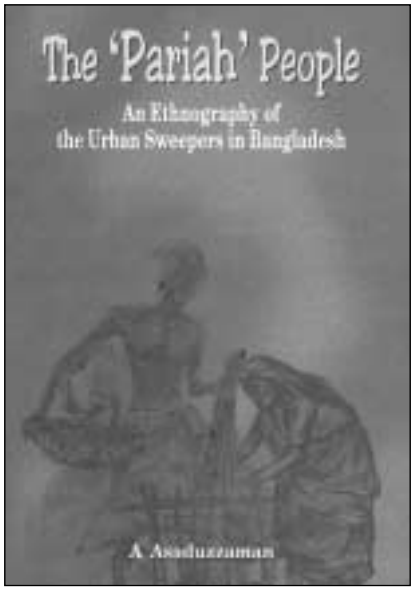

শতাব্দী ধরে হিন্দু সমাজের 'জাত'গুলোর বর্ণ মর্যাদা ওঠানামা করেছে; ফলে অনেক নিচু জাতই উঁচু বর্ণের মর্যাদা পেয়েছে ও উঁচু 'জাত' নিচু বর্ণে নেমে এসেছে। এসব খুবই জটিল ও বিভ্রান্তিকর।

এখানে আমাদের আলোচ্য হচ্ছে বাংলাদেশের শহরে বসবাসকারী 'অস্পৃশ্য' হিন্দু 'ডোম' ও 'মেথর' জাতের 'বর্ণ' মর্যাদাহীন সম্প্রদায়ের সমাজচিত্র। বাংলাদেশের সমাজবিজ্ঞানী ও নৃবিজ্ঞানীদের মধ্যে সর্বপ্রথম আসাদুজ্জামানই ঢাকা ও ফরিদপুর শহরে বসবাসকারী এই জনগোষ্ঠীর বিষয়ে একটি এথনোগ্রাফিক সমীক্ষা করেছেন যার ফল হচ্ছে এই বইটি।

আসাদুজ্জামান জানাচ্ছেন যে, ঢাকা শহরের মেথররা ইন্ডিয়ার 'অন্ধ্র' ও 'উত্তর প্রদেশ' এ দু'টি অঞ্চল থেকে আসা অভিবাসী। এদের ব্রিটিশ আমলে বাঙলায় আনা হয় শহুরে পয়ঃব্যবস্থা, শৌচাগার ও রাস্তাঘাট পরিষ্কার করার উদ্দেশ্যে। অন্ধ্র থেকে আসা অভিবাসীরা 'তেলুগু' ও উত্তর প্রদেশের অভিবাসীরা 'কানপুরি'। প্রথমোক্তরা তেলুগু ও শেষোক্তরা হিন্দিভাষী। তবে এ দু'জাতের মেথররাই কথ্য বাংলা সহজে বলতে ও বুঝতে পারে। ফরিদপুর শহরের মেথররা বিহারি। তারা নিজেদের 'হাড়ি' ও 'হেলা' বলে পরিচয় দেয়। তবে এগুলো তাদের 'গোত্র' নাম। তাদের 'জাতি' পরিচয় 'ডোম' যদিও আসাদুজ্জামান এ কথা উল্লেখ করেননি। অস্পৃশ্য জাতিগুলোর মধ্যে আবার মেথররা ডোমদের তুলনায় উঁচু মর্যাদা ভোগকারী।

ঢাকার তেলুগু মেথররা চারটি গোত্রে বিভক্ত যথা : 'কপুলু', 'মলুলু', 'মৎকুলু' ও 'চসারুলু'। এরা প্রত্যেকেই আবার নিজেকে একটি 'জাত' হিসেবে গণ্য করে। কিন্তু তারা সমমর্যাদাসম্পন্ন নয়, ক্রমোচ্চ মর্যাদা কাঠামোয় স্থাপিত যার শিখরে রয়েছে কপুলুরা। এ 'জাত'গুলোর প্রত্যেকের রয়েছে একটি সমাজ সংগঠন বা 'পঞ্চায়েত' যার প্রধানের পদবী হচ্ছে 'কুলপেডডা'। ফরিদপুরের 'হাড়ি' ও 'হেলা'দেরও 'পঞ্চায়েত' রয়েছে যার প্রধানের পদবী হচ্ছে 'মণ্ডল'। ঢাকার তেলুগু ও কানপুরি মেথররা চারটি বস্তিতে বাস করে। এগুলো ওয়ারি, ধলপুর, গোপীবাগ ও মোহাম্মদপুর মেথর পট্টি নামে পরিচিত। ফরিদপুরের ডোমদের নিবাসের নাম 'বান্ধবপল্লী'। তেলুগু ও কানপুরি মেথররা কিছু ধর্মান্তরিত খ্রিস্টান ছাড়া সবাই হিন্দু ধর্মাবলম্বী। তবে হিন্দু হলেও ফরিদপুরের ডোমরা বৈষ্ণব ধর্মের একটি শাখা 'জগৎবন্ধু' সম্প্রদায়ভুক্ত। এই 'জগৎবন্ধু সম্প্রদায়'-এর উদ্ভব ফরিদপুর শহরের কাছে আঙ্গিনা গ্রাম থেকে। এ গ্রামে জগৎবন্ধুর মন্দির ও আশ্রম রয়েছে। তবে বৈষ্ণব হলেও ফরিদপুরের ডোমরা ঢাকার তেলুগু ও কানপুরি মেথরদের মতো মাংসভোজী, নিরামিষাষী নয়।

আসাদুজ্জামানের এথনোগ্রাফি থেকে জানা যায় যে, অস্পৃশ্য জাত বলে মেথররা সর্বদাই 'অশুচি' ও 'অশুদ্ধ' হলেও তারা ব্রাহ্মণ্য দেবতা শিব, রাম ও ভেঙ্কটেশ্বর (বিষ্ণু)-এর পূজা করে। তেলুগুরা পিতৃপুরুষেরও পূজা করে এবং তাদের পরিবার মাতৃশাসিত। ফরিদপুরের ডোমরা বৈষ্ণব হলেও তাদের বড় উৎসব হচ্ছে সূর্য পূজা। এছাড়া তারা কালীপূজাও করে যার পুরোহিত হচ্ছে একজন বাঙালি ব্রাহ্মণ। এ কালীর নাম শ্যামা। কিন্তু এ পূজায় ডোমরা অংশ নিতে পারে না। আবার ডোমরা শ্মশান কালীরও পূজা করে যার পুরোহিত হচ্ছে তাদেরই গোত্রভুক্ত 'কালী ঠাকুর' পদবিধারী একজন লোক। এ থেকে দেখা যায় যে, 'ডোম'রা যে আদিম দেশজ গোত্র বা উপজাতি ছিল তার নিজস্ব দেবতাদের পূজা তারা ছাড়েনি। সূর্যপূজাও ব্রাহ্মণ্য সূর্য দেবতার পূজা নয়। এটিও অনার্য ধর্ম ঠাকুরের পূজা। অন্যদিকে 'তেলুগু' ও 'কানপুরি'রাও অস্পৃশ্য আদিবাসী গোত্র থেকে উদ্ভূত দেশজ আদিম দেবতাদের পরিবর্তে ব্রাহ্মণ্য দেবতাদের পূজার মাধ্যমে তাদের 'জাত' মর্যাদা উন্নত করার চেষ্টা করছে। এ প্রক্রিয়াকে সমাজবিজ্ঞানী শ্রীনিবাস 'সংস্কৃতায়ন' বলে অভিহিত করেছেন। ফরিদপুরের ডোমদের বৈষ্ণব ধর্মান্তরণও একই উদ্দেশ্যে কারণ 'জগৎবন্ধু' প্রকৃতপক্ষে বিষ্ণু- এক আর্য দেবতা। যদিও তারা একইসঙ্গে আদিম অনার্য দেবতা কালীরও পূজা করছে যা বৈষ্ণব ধর্মের বিরোধী। কারণ পৌরাণিক হিন্দু ধর্মের পাঁচটি বিভাজনের মধ্যে কালী 'শাক্ত' ও বিষ্ণু 'ভাগবত' সম্প্রদায়ের প্রধান উপাস্য দেবতা।

আসাদুজ্জামানের বইটি নিঃসন্দেহে আমাদের

বাংলাদেশী প্রজন্মের কাছে এক অজানা পৃথিবীকে পরিচয় করিয়ে দেবে। কারণ এদেশে যারা ৪০-এর দশকে মফস্বল শহরে স্যানিটারি পায়খানা পূর্বকালে জন্মেছে তারা সবাই ডোম ও মেথরদের সেবার সঙ্গে পরিচিত, যাদের কাজ ছিল শহরের প্রতিটি বাড়ির মলভাণ্ড পরিষ্কার করা। ডোমদের দিয়ে গৃহস্থের মরা গরু সরানো ও হাসপাতালে লাশকাটার কাজও করানো হতো। এখনও হাসপাতালগুলোর মর্গে ডোমরা লাশকাটার কাজ করে। কারণ জীবিকা হিসেবে কোনো মুসলমান ও হিন্দু এ কাজ নিতে রাজি নয়। তাই এ বইটি দেশের একটি জাতিগত সংখ্যালঘু (Ethnic Minority) সম্প্রদায়ের জীবন ও তাদের সমাজ সংগঠনের রূপ উন্মোচন করে বাংলাদেশের সমাজবিজ্ঞানের একটি শূন্যতা পূরণ করেছে। তবে আসাদুজ্জামান ফরিদপুরের ডোম ও ঢাকার মেথরদের তাদের অস্পৃশ্য 'জাতি' মর্যাদা, ধর্মীয় মতাদর্শ ও সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ও বক্তব্যকে যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন সেটি মেনে নেয়া মুশকিল। আসাদুজ্জামান বলেন যে, 'মেথররা বিশ্বাস করে যে ভগবান সব মানুষকে সমান মর্যাদা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন এবং সমাজে অস্পৃশ্য মর্যাদাভোগী হলেও ভগবান তাদের নিচু জাত বলে সৃষ্টি করেননি। সমাজে তাদের অস্পৃশ্য 'জাতি' মর্যাদা মানুষের সৃষ্টি। শাস্ত্র বা ধর্মগ্রন্থে যাই লেখা থাক না কেন।'

আসাদুজ্জামানের বক্তব্য অনুযায়ী ডোম ও মেথররা সমাজ কর্তৃক তাদের নির্ধারিত কাজ অর্থাৎ মল, নর্দমা, পয়ঃনালা ও আবর্জনা পরিষ্কার করা 'জাতিধর্ম' নয় ও হিন্দু সমাজে তাদের যে অস্পৃশ্য মর্যাদা তা ভগবান স্থির করে দেননি বলে বিশ্বাস করে। এছাড়া তারা হিন্দুধর্মের 'কর্মবাদ'ও মানে না যেখানে এ জন্মে মানুষের জাতি অবস্থান পূর্বজন্মে কৃতকর্মের ফল অনুযায়ী হয় বলা হয়েছে। আসাদুজ্জামানের মতে ডোম ও মেথররা মনে করে 'জাতিধর্ম' ও 'কর্মবাদ' ব্রাহ্মণরা বানিয়েছে। এসব ভগবানের নির্দেশ নয় বা ধর্মশাস্ত্রে নেই।

আসলে আসাদুজ্জামানের জবানিতে ডোম ও মেথররা তাদের অস্পৃশ্য জাতি মর্যাদা সম্পর্কে যেসব কথা বলেছে ও যা আসাদুজ্জামানও বিশ্বাস করেছেন তা দক্ষিণ এশিয়ায় পশ্চিমের আধুনিক চিন্তাধারণা প্রবেশের পরে রচিত হয়েছে। হিন্দু 'জাতি-বর্ণ' ব্যবস্থা অমানবিক ও সামাজিক বৈষম্যমূলক এ চিন্তা দক্ষিণ এশিয়ায় পাশ্চাত্যের মতাদর্শিক অভিঘাতের ফল। যদিও হিন্দু সভ্যতায় ব্রাহ্মণ্যবাদ বিরোধী চিন্তা-দর্শনের উদ্ভব প্রাচীনকালেই হয়েছিল। ব্রাহ্মণ্য দর্শন অর্থাৎ বেদ ও জাতিবর্ণ প্রথা বিরোধী এ প্রাচীন মতবাদের নাম 'লোকায়ত'। লোকায়ত বা চার্বাক মতবাদ ইহজাগতিকতা ও বস্তুবাদ প্রচার ও পরলোক যা ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করে। তবে ব্রাহ্মণ্যবাদী বৈদিক ধর্মীয় দর্শনের কর্তৃত্ববাদী অবস্থার বিপরীতে লোকায়ত মতাদর্শ দক্ষিণ এশিয়ায় বলিষ্ঠ মতাদর্শিক ঐতিহ্য হয়ে দাঁড়াতে পারেনি। ১৯ ও ২০ শতকে রামমোহন রায়, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, দয়ানন্দ সরস্বতী, আর.জি. রানাডে ও টি.ভি. বাসওয়ানি প্রমুখ ব্রাহ্মণরা হিন্দুধর্ম সংস্কার আন্দোলনগুলি খ্রিস্টান মিশনারিদের প্রচারণার প্রতিক্রিয়ায় হিন্দুসমাজকে ব্যাপক ধর্মান্তরকরণের ঝুঁকি থেকে রক্ষার তাগিদে শুরু করেছিলেন। মধ্যযুগেও ইন্ডিয়ায়

> **The 'Pariah' People**
> An Ethnography of the Urban Sweepers in Bangladesh;
> University Press Ltd., Dhaka, 2001, PP. I-X, 296;
> Tk. 400.00

ইসলাম ধর্মের আগমনের প্রতিক্রিয়ায় হিন্দু ধর্ম সংস্কার আন্দোলন হয়েছিল। ইসলামের সাম্যবাদী আবেদন ঠেকাতে ব্রাহ্মণরা বৈষ্ণব ও ভক্তিধর্মের জন্ম দিয়েছিলেন। অন্যান্য ব্রাহ্মণ্যধর্ম বিরোধী সম্প্রদায় যেমন কবীরপন্থ, বাউল ও শিখ ধর্মও ইসলামের প্রভাবে আবির্ভূত হয়েছিল। সমাজে বিদ্যমান বৈষম্য ও মানুষের উঁচু-নিচু মর্যাদা যতই অনাকাঙ্ক্ষিত হোক না কেন উদ্ভবের পর থেকে আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে যত সমাজ দেখা গেছে তার সবগুলিই সামাজিক মর্যাদার ক্রমোচ্চ কাঠামোয় গঠিত। তবে হিন্দু 'জাতিবর্ণ ব্যবস্থা' সারা পৃথিবীতে অদ্বিতীয় এই অর্থে যে এটি হিন্দু ধর্মশাস্ত্র অনুমোদিত অর্থাৎ ঈশ্বর নির্দেশিত। ব্রাহ্মণ্যবাদী ধর্মীয় দর্শনের মূল বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে 'জাতিধর্ম' ও 'কর্মবাদ'-এর ধারণা। এ ধারণা দু'টির প্রভাব এতই সুগভীর যে এমনকি বেদ ও ব্রাহ্মণ্যবাদ বিরোধী বৌদ্ধধর্মও তাকে গ্রহণ করেছে।

তবে এখন যে জাতিবর্ণ ব্যবস্থা হিন্দুসমাজে দেখা যায় তা বহু পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এ পর্যায়ে এসেছে। ব্রিটিশ সমাজবিজ্ঞানী সুসান বেইলি বলেছেন যে এখনকার হিন্দু জাতিব্যবস্থা মুঘল সাম্রাজ্য পতনের সময়ে বর্তমানের রূপটি নেয়। এর উদ্ভব যে অতি প্রাচীনকালে তাতে সন্দেহ নেই কারণ রামায়ণ ও মহাভারতে ও বৌদ্ধ ধর্ম সাহিত্যে 'জাতিবর্ণ'-এর উল্লেখ রয়েছে। তবে এ কথাও মনে রাখা দরকার যে বর্তমানের হিন্দুধর্মে একইসঙ্গে অত্যন্ত শক্তিশালী 'জাতিবর্ণ' বিরোধী ধর্মচিন্তা ও দর্শনের ঐতিহ্য বহমান। এটি হচ্ছে আত্মনিগ্রহী তপশ্চর্যার ধারা। যোগসাধনা এই তপশ্চর্যারই অংশ যাকে পৌরাণিক হিন্দুধর্ম আত্তীভূত করেছে। প্রাক-বৈদিককালে দক্ষিণ এশিয়ায় উদ্ভূত আত্মনিগ্রহী তপশ্চর্যামূলক অনার্য ধর্ম বিশ্বাসের ঐতিহ্যেই পরবর্তীকালে আজীবিক, জৈন ও বৌদ্ধধর্ম আবির্ভূত হয়েছিল। তাই ভস্মাবৃত শ্মশানচারী সন্ন্যাসী, যোগী, সাধু ও অবধূত হিন্দুসমাজ সংগঠনের বাইরে বাস করলেও তারা শ্রদ্ধা ও ভজনার পাত্র। এছাড়া যেসব ব্রাহ্মণ্যবাদ বিরোধী সম্প্রদায় 'জাত-পাত'-এর অনুশাসন অস্বীকার করে মানবতাবাদের ভিত্তিতে নিজেদের চিহ্নিত করে তারাও কিন্তু হিন্দুসমাজ সংগঠনের বাইরে নিজেদের গণ্য করে না এবং পুরাণ, মনুসংহিতা ও গীতার প্রাধান্য অস্বীকার করে না। তাদের স্বাতন্ত্র্যের চিহ্ন হচ্ছে ঈশ্বরের প্রকৃতি ও ঈশ্বরের সঙ্গে তার সৃষ্টির সম্পর্ক নিয়ে তাদের নিজস্ব ব্যাখ্যা। এ ব্যাখ্যায় ঈশ্বরকে নেহায়েতই একজন প্রেমিক পুরুষ ও মানুষের সাথে তার শুধু ভালোবাসার সম্পর্ক এ কথা বলা হয়েছে। ঈশ্বর ও মানুষকে এরকম ব্যক্তিগত প্রেমের সম্পর্কে দ্রবীভূত করার শ্রেষ্ঠ প্রয়াস ষোড়শ শতাব্দীর বাঙলায় উদ্ভূত বৈষ্ণবধর্মে দেখা যায়।

আসাদুজ্জামানের বক্তব্য : 'তেলুগু মেথরদের ধর্মান্তর শুধু এক ধর্ম থেকে অন্য ধর্মে গমন নয়..... তা..... হিন্দুধর্মীয় মতাদর্শের প্রত্যাখ্যান, যে মতাদর্শে জন্মসূত্রে অর্জিত মানুষের মর্যাদাকে সামাজিক-ঐশ্বরিক বৈধতা দেয়া হয়েছে। ধর্মান্তর সেজন্য মেথরদের শুধু হিন্দু সামাজিক-ঐশ্বরিক বিধান রূঢ়ভাবে অস্বীকার করাই নয় তা মোফাত ও দুর্মোর সিদ্ধান্তের বিরোধীও। ধর্মান্তরের মাধ্যমে মেথররা যে হিন্দু ধর্মবিশ্বাস ও দর্শনের নিষ্ক্রিয় অনুসারী নয় তা প্রমাণ করেছে' (পৃ.২৫৩) তাই নৃবিজ্ঞানীর মূল্যবোধ নিরপেক্ষ বিশ্লেষণের বদলে আধুনিককালের সাম্যবাদী ও মানবতাবাদী চিন্তা ও মতবাদের প্রভাবে উচ্চারিত মূল্যায়ন বলে মনে হয়। আসাদুজ্জামান তার মূল্যায়নে যা বলেছেন তা যদি সত্যি হতো তাহলে দক্ষিণ এশিয়ায় কোনো অস্পৃশ্য জাতি থাকত না, তারা বহু শতাব্দী আগেই বৌদ্ধ, মুসলিম অথবা খ্রিস্টান হয়ে যেত এবং হিন্দু জাতিধর্ম নির্ধারিত দায়িত্ব মনুষ্যবিষ্ঠা ও শহরের আবর্জনা সাফ করার কাজ করত না। লক্ষ্যণীয় যে তেলুগু মেথররা যেখানে 'জাতিবর্ণ' প্রথা ঈশ্বর নির্দেশিত নয় বলে দাবি করে বলে আসাদুজ্জামান জানিয়েছেন সেখানে তারা ঐ 'জাতি' প্রথা নিজেদের মধ্যে অনুকরণ করে উঁচু ও নিচু মর্যাদা নির্ণয় করেছে যদিও তারা বৃহত্তর হিন্দুসমাজে বর্ণহীন 'অস্পৃশ্য' অভিন্ন মেথর জাতের অন্তর্ভুক্ত। এ থেকেই আসাদুজ্জামানের মূল্যায়ন যে ভ্রান্ত তা বোঝা যায়।

এ কথা ঠিক যে অস্পৃশ্যরা বৌদ্ধ, ইসলাম ও খ্রিস্টধর্মে অতীতে ও বর্তমানে ধর্মান্তরিত হয়েছে এবং এখন ইন্ডিয়ায় অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে 'দলিত'দের জঙ্গি আন্দোলন রয়েছে। কিন্তু এরকম ধর্মান্তর ও জাত-পাত বিরোধী আন্দোলন ব্যাপক নয় বরং ব্যতিক্রমী ঘটনা এবং এগুলো ব্রাহ্মণ্যবাদকে গত আড়াই হাজার বছর ধরে তার কর্তৃত্বমূলক অবস্থান থেকে বিন্দুমাত্র নড়াতে পারেনি। এমনকি মানবসভ্যতার সবচেয়ে বৈপ্লবিক সাম্যবাদী মতাদর্শ মার্ক্সবাদও সমকালীন ইন্ডিয়ায় অস্পৃশ্যতাকে সমাজ থেকে হঠাতে সক্ষম হয়নি। লক্ষ্যণীয় যে গান্ধী, নেহেরু লালবাহাদুর শাস্ত্রী, ইন্দিরা, মোরারজি দেশাই, রাজীব গান্ধী, নরসিংহ রাও, অটল বিহারি বাজপেয়ি সবাই ব্রাহ্মণ। আরেক প্রধানমন্ত্রী বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং ছিলেন ক্ষত্রিয় অর্থাৎ উঁচু বর্ণভুক্ত। কমিউনিস্ট নেতা নম্বুদিরিপাদও ব্রাহ্মণ। আধুনিক ইন্ডিয়ার সবচেয়ে বিখ্যাত অস্পৃশ্য নেতা আম্বেদকার (১৮৯১-১৯৫৬) যাকে গান্ধী ও নেহরুর সমপর্যায়ের প্রভাবশালী জাতীয় নেতা হিসেবে গণ্য করা হয় তিনিও অস্পৃশ্যতা বিলোপ করতে সক্ষম হননি। এ ব্যাপারে তাঁর একমাত্র অর্জন ছিল ধর্মবিশ্বাস ও 'জাতীয়তার' বদলে আইনসভায় 'আদিবাসী' ও নিম্নবর্ণের হিন্দুদের জন্য স্বতন্ত্র আসন সংরক্ষণের অধিকার প্রতিষ্ঠা। এটি ১৯৩২ সালে ব্রিটিশ সরকারের 'সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ' রূপে ঘোষিত হয়– যেটি ১৯৩৫ সালের ইন্ডিয়া শাসন আইনে অন্তর্ভুক্ত হয়। এর ফলে ইন্ডিয়ার প্রতিটি প্রদেশের আইনসভায় 'ধর্মীয় সংখ্যালঘু' ও 'তফসিলি জাতিগুলো'র জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যক আসন সংরক্ষিত করা হয়। নিচু জাতগুলোকে এ আইন সমাজে উঁচু মর্যাদা দিতে সক্ষম না হলেও এই 'কোটা' ও 'সংরক্ষণ' নীতির প্রধান ঐতিহাসিক পরিণতি হয়েছিল ১৯৪৭-এ 'বাঙলা' ও 'পাঞ্জাব'-এর বিভাজন।